International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-V, Issue-III, May 2019, Page No. 29-35
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.v5.i3.2019.29-35

ঔপনিবেশিক পর্বে মধ্য শিক্ষা পর্ষদ গঠনের চেষ্টা ও নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি

প্রবাল সেনগুপ্ত
সহযোগী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, হুগলী মহসিন মহাবিদ্যালয়, হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ

Abstract

Since its inception in 1921, ABTA, the organization of Secondary teachers all over Bengal, has been playing a pivotal glorious role in the sphere of the professional life- struggle of the secondary teachers. During its long journey only once this organization compromised with its secular stand. That was in 1937, when Fazlul Haque, the then Education Minister, took initiative for first time Free secondary education from the clutch of the top-heavy Calcutta university and lay the duty of controlling secondary education in the hands of a secondary education board, comprising members, elected or nominated from the major social segments of the society, which would have resulted into major inclusion of Muslims into the body of the Board, as opposed to upper caste Hindu control as was unusual during the University control dominated mainly by upper caste Hindus. The upper-caste Hindu leadership strongly opposed the move through Congress and Hindu Mahashava. The leadership of the ABTA (also belonging to upper caste Hindu fold) also opposed this move as 'antinational'. In doing so, ABTA joined hands even the upper caste Hindu dominated managing committees, so long considered to be its traditional opponent. True nationalism is supposed to support representation of the majority segments of the population even though they may be backward culturally. Naturally in the field of education upper caste Hindus opposed this move. The leadership of the ABTA failed to appreciate this aspect of the opposition against the move. As a result the first ever movement of freeing secondary education from the control of top-heavy university had to be postponed for an uncertain long period. Thus the first ever move to give autonomy to secondary education failed. This short-sightedness of the ABTA leadership was no less responsible for this regressive development.

Keywords: Teachers' Association, Board of Secondary Education, top-heavy administration of the university, Feeder educational institutions, school managing committees, Bengalee gentry, board constituted on communal bases, class-nature of the middle class, majority and minority nationalism, Floud Commission, League – Haque Ministry, Hindu Mahasabha.

A.B.T.A.- নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির নাম শুনলেই আজও শিক্ষা জগতের সঙ্গে যুক্ত সকলেরই শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে আসে। ১৯২১ এর জন্মলগ্ন থেকেই মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষকদের ন্যায্য রুটি-রুজির লড়াইয়ের অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিল এই সংগঠন হাজার ১৯৪৮ এরপর সংগঠনের নেতৃত্বে ও বামপন্থীদের করায়ত্ত হবার পর তো শিক্ষক স্বার্থে বৈপ্লবীক ভূমিকা গ্রহণ করেছিল সংগঠনটি। বিশেষ করে ১৯৫৪স্মরণীয় ১২ দিনের লড়াই ও সেই সংগ্রামের অবিস্মরণীয় নেতা সত্যপ্রিয় রায়ের ভূমিকা বিশ্ব শিক্ষক সংগ্রামে একটি স্মরণীয় সৃষ্টি করেছিল এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।[১]

শিক্ষক সমিতির এই দীর্ঘ পথ চলায় একবারই এদের ভূমিকা নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছিল। সেটি হচ্ছে মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণমুক্ত পৃথক বোর্ড গঠনের ক্ষেত্রে সমিতির ভূমিকা। শিক্ষা বোর্ড গঠনের প্রস্তাব ও সমিতি প্রতিক্রিয়ায় আজকে আমাদের আলোচ্য বিষয়। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্মলগ্ন থেকেই আমাদের দেশের বিদ্যালয় শিক্ষার পরিচালনার ভার বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপরই ন্যস্ত ছিল।[২] এটা স্বাভাবিকই মাথা ভারী প্রশাসনের সাহায্যে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শ্রেণীর বিশাল দায়িত্ব সামলে বিদ্যালয় শিক্ষার প্রতি বিশ্ববিদ্যালয় কমই নজর দিতে পারতো। এর পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে মাধ্যমিক বিদ্যালয় সমূহের সামন্ততান্ত্রিক পরিচালকবর্গ এবং কখনো কখনো প্রধান শিক্ষকেরা স্বৈরাতান্ত্রিক ভাবে বিদ্যালয়ের পরিচালন করত।[৩] শরৎচন্দ্রের পল্লীসমাজ থেকে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের টিচার বিভিন্ন যুগের কাহিনী পড়লেই আমরা এর যথার্থতা অনুধাবন করতে পারি।

স্যার আশুতোষ মুখার্জী যখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্য সেই সময় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ প্রথম কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের মান উন্নয়নের ক্ষেত্রে ফিডার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের গুরুত্ব অনুধাবন করে।[৪] বিশ্ববিদ্যালয় কর্ণধর আশুতোষ এই সময় সার্বিকভাবেই মন্তব্য করেছিলেন Education in the university is the development, amplification of school and some issues, its complement' [৫] তিনি মাধ্যমিক শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য 'দুর্নীতিগ্রস্ত 'ম্যানেজিং কমিটির ওপর বিশ্ববিদ্যালয় অধিকতর নিয়ন্ত্রণ আরোপের পক্ষপাতি ছিলেন। শিক্ষকদের নূন্যতম বেতন ,নিয়মমাফিক পরিচালন সমিতি গঠন,ছাত্রদের হাজিরা সব বিষয়ে নজর রাখতে তিনি সচেষ্ট হয়েছিলেন। ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয়, স্কুলগুলির সামগ্রিক মান বৃদ্ধির মানসে ,প্রধান শিক্ষকবৃন্দ ও ম্যানেজিং কমিটির সঙ্গে নিয়মিত বৈঠকে বসারও সিদ্ধান্ত নেয়।[৬]

এদিকে ঔপনিবেশিক সরকার ১৯১৭ তে এ দেশের শিক্ষাব্যবস্থার সামগ্রিক মান উন্নয়নের উদ্দেশ্যে 'স্যাডলার কমিশন 'নিয়োগ করে। এই কমিটি অন্যান্য সুপারিশের পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা সম্পর্কে মন্তব্য করে, 'No satisfactory reorganisation of the university system of Bengal will be possible unless and until a radical reorganization of the system of Secondary Education upon which university work depends, is carried into effect'[৭] তখন থেকেই ভাবনাচিন্তা শুরু হয় ,মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য আলাদা প্রশাসনিক ব্যবস্থা গঠনের।

ইতোমধ্যে ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের 'ভারত শাসন আইন' অনুযায়ী প্রাদেশিক ক্ষেত্রে 'দ্বৈত শাসনের 'শুরু হয়। শিক্ষা দপ্তরের দায়িত্ব ন্যস্ত হয় দেশীয় প্রতিনিধিদের হাতে। কিন্তু সেই সময় সুযোগ থাকা সত্ত্বেও প্রভাস চন্দ্র মিত্র বা মৌলভী ফজলুল হকের মতো শিক্ষা মন্ত্রীরা মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থার মূলগত পরিবর্তনে কোনো উৎসাহ দেখাননি। এদিকে ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে ভারত শাসন আইন অনুযায়ী, ১৯৩৭ নির্বাচনের পর বাংলার শাসনভার কৃষক প্রজাপাটি ও মুসলিম লীগ জোটের করায়ত্ত হল।যদিও কংগ্রেস নেতৃত্বের অপরিণামদর্শিতার ফলেই ফজলুল হকের কৃষক প্রজাপাটি, মুসলিম লীগের শরিক হতে বাধ্য হয়েছিল ,তবুও মুসলিম জনগোষ্ঠী প্রভাবিত এই সরকার তৎকালীন বাংলার সব ক্ষেত্রের মতোই শিক্ষা ক্ষেত্রে অগ্রণী হিন্দু উচ্চবর্ণের ভদ্রলোক শ্রেণীর বিরাগভাজন হয়ে পড়েছিল , মুসলিম সংখ্যা গরিষ্ঠ বাংলায় সরকার ও আমাদের আলোচ্য ক্ষেত্রে শিক্ষাব্যবস্থায় মুসলিম জনগোষ্ঠীকে নিয়ন্ত্রক হবে এই সহজ সত্য তারা মেনে নিতে প্রস্তুত ছিল না।[৮]

নতুন মন্ত্রিসভা গঠিত হলে শিক্ষা দপ্তরের ভার নিলেন বাংলার প্রধানমন্ত্রী আব্দুল কাশেম ফজলুল হক, স্বয়ং। এই মন্ত্রিসভা হয়তো সাম্প্রদায়িক চাল হিসেবেই 'হিন্দু নিয়ন্ত্রিত' বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃত্ব থেকে মাধ্যমিক শিক্ষাকে বিযুক্ত করতে তৎপর হলো। ফজলুল হক আজন্ম অসাম্প্রদায়িক একজন মানুষ- ব্যক্তিগতভাবে সাম্প্রদায়িকতায় নয়- বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনতার হাতে শিক্ষার নিয়ন্ত্রণে রশি থাকুক- এটুকুই তাঁর কাম্য ছিল। আর মুসলিম লীগ যতই সাম্প্রদায়িক হোক না, কেন শিক্ষা ক্ষেত্রে এই পরিবর্তনের পক্ষে দাঁড়িয়ে, 'ইতিহাসের অচেতন যন্ত্রের' মতোই প্রদেশের সংখ্যা গরিষ্ঠ জনতা দীর্ঘদিনের ইচ্ছা পূরণের সহায়ক হয়েছিল -এটা ঐতিহাসিক সত্য।[৯]

এর আগে ১৯২০-২৯ সময় পর্বে ঔপনিবেশিক প্রশাসন অনেকবারই মাধ্যমিক শিক্ষা সংস্কারের চেষ্টা করলেও, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদারপন্থী, কংগ্রেস বা হিন্দু মহাসভা কোন দলই এ বিষয়ে খুব একটা উৎসাহ দেখায় নি। মূলতঃ বর্ন হিন্দুদের নিয়ন্ত্রণাধীন এই তিন দলের জোতদার জমিদারদের যে মৌরসী পাট্টা শিক্ষা ক্ষেত্রে ছিল - তা ভাঙতে চাইত না। এই পরিস্থিতিতে নতুন সরকার একটি বিলের খসড়া করে, মাধ্যমিক শিক্ষা কে পৃথক বোর্ডের নিয়ন্ত্রণে আনার ইচ্ছা প্রকাশ করে। এই খসড়া পরবর্তীকালে নামে 'Bengal Secondary Bill'1940' নামে আত্মপ্রকাশ করে। সেটা অবশ্য কিছু পরের কথা।[১০]

এই খসড়া বিল অনুযায়ী নতুন বোর্ডের সদস্য সংখ্যা হবে পঞ্চাশজন, যারা মধ্যশিক্ষার সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন ক্ষেত্রে থেকে নির্বাচিত বা মনোনীত হবেন। এছাড়া থাকবেন সরকারি প্রতিনিধিরা। বোর্ডের সভাপতি হবেন সরকার মনোনীত। সভাপতিকে বাদ দিয়ে বাকি ঊনপঞ্চাশজন সদস্যের মধ্যে ২২ জন হিন্দু কুড়িজন মুসলিম এবং সাতজন ইউরোপিয়ান গোষ্ঠীগুলি থেকে আসবেন এইরকমটা বলা হয়। বোর্ডের কার্যকরী সমিতির মোট ১৪ জন সদস্যের মধ্যেও, এক্ষেত্রেও সভাপতি বাদে বাকি সদস্যদের ৬ জন হিন্দু ৫ জন মুসলমান ও একজন ইউরোপিয়ান সম্প্রদায়ভুক্ত হবে এরকম প্রস্তাব করা হয়। বোর্ডের গঠন থেকে এটা পরিষ্কার কোন ভাবে এখানে মুসলমান সদস্যদের সংখ্যাধিক্য হচ্ছে না -সভাপতি পদে যদি একজন মুসলিম নির্বাচিত হন -তবু দুই সম্প্রদায়ের সদস্য সংখ্যা সমান হচ্ছে।[১১] শিক্ষা মন্ত্রী ফজলুল হক এই মাধ্যমিক বিলের মাধ্যমে শুধু শিক্ষা ক্ষেত্রে বাংলা সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের মুসলমানদের ন্যায্য প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করতে চেয়েছিলেন -অন্য কিছু নয়।

কিন্তু বর্ণ হিন্দু প্রাধান্য বিশিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে, আলোচনার জন্য এই বিল প্রেরিত হলেও মূলতঃ, 'The board must be constituted on academic lines and must not be based on communal politics' এর অজুহাত তুলে বিলের তুমুল বিরোধিতা করা হলো।[১২] আশ্চর্যজনকভাবে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মতো হিন্দুত্ববাদী ব্যক্তির সঙ্গে বিধান চন্দ্র রায়, চারুচন্দ্র বিশ্বাস বা প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মত 'সিন্ডিকেট' সদস্যরা বিলের তীব্র বিরোধিতা করতে শুরু করলেন। তারা প্রচ্ছন্ন হিন্দু গৌরবে ভুলে গেলেন সমস্ত অবিভক্ত ভঙ্গের স্কুল ও মাদ্রাসা গুলিতে মুসলিম ছাত্র সংখ্যা যথেষ্ট থাকলেও, ঐতিহাসিক কারণেই হিন্দু বা বর্ণ হিন্দু রা স্কুলের ম্যানেজিং কমিটি বা শিক্ষকদের মধ্য মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল- তাদের দ্বারাই স্কুলের নিয়ম কানুন এমনকি অনেক সময় পাঠ্যসূচি নির্ণীত হত - এক্ষেত্রে অনেক সময় হিন্দুয়ানী প্রভাব যে পড়তো না এমন নয়।[১৩] আসলে বর্ণহিন্দু উপরোক্ত নেতারা এই আধিপত্য ক্ষুন্ন হবার ভয়ে ভীত হয়ে পড়েছিলেন। বিধানচন্দ্র বা চারুচন্দ্রের সঙ্গে শ্যামাপ্রসাদের রাজনীতির মূলগত পার্থক্য থাকলেও, এরা সকলেই ছিলেন বর্ণ হিন্দু ভদ্রলোক শ্রেণীর প্রতিনিধি। তাই এই বিষয়ে তাদের প্রতিক্রিয়া সমরূপই ছিল।

সাম্প্রতিক এক গবেষণায় দেখা গেছে যে স্যাডলার কমিশন সুপারিশের ভিত্তিতে প্রস্তাবিত এই মধ্যশিক্ষা বিলের মাধ্যমে অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো শিক্ষাক্ষেত্রেও এতদিনকার অবদমিত বাংলার মুসলিম সমাজ নতুনভাবে জেগে উঠতে চাই ছিল। তারা 'Sought to remove secondary education from the clutches of Calcutta University... Actually the Muslims by and large, believed that the creation of the secondary education board would give them a say in the control of the education system of the

province.'[১৫] এই বিল প্রণয়নের ক্ষেত্রে মুসলিম লীগ নেতৃত্বের রাজনৈতিক চালের কথা যদি আমরা মেনে নিই, তাহলে বলতে হবে যে, বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনতার এই চাওয়ার মধ্যে অন্যায় কিছু ছিল না।

আর হিন্দু নেতৃত্বে মুখে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে বোর্ডের সদস্য নির্বাচন শিক্ষার spirit নষ্ট করবে, বললেও আসলে 'প্রথমে ইংরেজি শিক্ষার সুযোগ লাভ কারী' বর্ণহিন্দুরা শিক্ষা ক্ষেত্রে একক আধিপত্যের সুযোগে যে হিন্দুয়ানী কায়েম করেছিল তার অবলুপ্তির সম্ভাবনা তেই ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল। ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে অমৃতবাজার পত্রিকা এই মনোভাবের প্রতিধ্বনি তুলে তাই বলেছিল, the object of the bill is to strike a fatal blow at te political and social power of the Hindu community and to place education as a monopoly in the hands of a Board will be a tool in the armoury of Muslim government.'[১৬]

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের কথা অনুযায়ী মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য বেসরকারিভাবে যে অর্থ ব্যয় হয় - তার বেশির ভাগ অর্থই হিন্দুরা দেয়, তাই শিক্ষা প্রশাসনে তাদের আধিপত্য থাকাটাই বাঞ্ছনীয়।[১৭] একথা যদি সত্য বলে মেনে নিও, 'শুধু টাকা দিই' বলে বাংলা সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনতাকে শিক্ষা ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা কোন আদর্শের নিরিখে বর্ণহিন্দুদের থাকতে পারে - তার কোন সদুত্তর হিন্দু নেতৃত্বের কাছ থেকে পাওয়া যায়নি। এই বিল নিয়ে আইন সভার বিতর্ক একটা সাম্প্রদায়িক খেউরে পরিণত হয়েছিল। প্রস্তাবিত মধ্যশিক্ষা পর্ষদ এর গঠন, সরকার নিরপেক্ষ ভাবে কতটা একে স্বশাসন দেওয়া যায়, শিক্ষক প্রতিনিধিত্বের শূন্যতা ঘুচিয়ে, সত্যিই যারা প্রত্যক্ষ ভাবে মানুষ গড়ার কারিগর তাদের কিভাবে প্রতিনিধিত্ব দেওয়া যায়-এসকল বিষয়ে বদলে হিন্দু না মুসলিম কাদের প্রাধান্য থাকবে, তাই নিয়ে সস্তা তর্ক শুরু হয়। হরেন্দ্রনাথ চৌধুরীর মতো আপাত অসাম্প্রদায়িক কংগ্রেস নেতা আলোচনায় বলে ফেলেন, '...বর্ণহিন্দুরাই তাদের রক্ত দিয়ে এইসব স্কুল গড়েছেন'- উত্তরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি ফজলুর রহমান স্পষ্টভাবে বলেন, এই টাকা, 'গরিব কৃষকের খরচায় বলুন। আপনার আয় তো গরিব কৃষকের থেকেই'।[১৮] মুসলিম লীগ সদস্যের 'সাম্প্রদায়িক ইঙ্গিতের' সমালোচনা করেও বলা যায় যে, ফজলুর রহমানের কথার মধ্যে যথেষ্ট সত্য লুক্কায়িত আছে। বাংলার তৎকালীন মাধ্যমিক বিদ্যালয় গুলির একাধারে প্রতিষ্ঠাতা ও মালিক ছিল বর্ণহিন্দুজাত জমিদার শ্রেণীর লোকেরা। তাদের আয়ের উৎস ছিল, কৃষক ও অর্থ - আর বাংলার কৃষকরা বৃহদংশে ছিল মুসলমান ও নিম্নবর্গের হিন্দু। এই শোষণজাত ও অর্থের খুব সামান্যই জোতদার - জমিদার শ্রেণী শিক্ষাখাতে ব্যয় করত। এর পিছনেও তাদের প্রজাহিতৈষণার থেকেও বলবতি ছিল নিজেদের যশ-খ্যাতি বৃদ্ধির লোভ। তাই প্রকান্তরে মুসলিম জনতার অর্থ বাংলা শিক্ষা ক্ষেত্রে ব্যয়িত হত - এর মধ্যেই মিথ্যা নেই কিছুই।

এবার আসা যাক, আইনসভার বাইরে, এই বিলের পক্ষে বিপক্ষে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার কথায়। এই বিতর্কে কিন্তু মূল ভূমিকা গ্রহণ করেছিল বাংলার মাধ্যমিক শিক্ষকেরা। বিশেষ করে তাদের ঐতিহ্যবাহী সংগঠন নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি বা A.B.T.A.। ৩৭' এর বিলের ৬ ই আগস্ট বিলের খসড়া প্রকাশের অব্যাহতি পরেই অ্যালবার্ট হলে, স্কুল পরিচালক সমিতির গুলির সদস্য ও শিক্ষকদের এক সভা ডাকা হয়। এই সভাটিতে স্বাভাবিকভাবেই হিন্দু শিক্ষকদের প্রাধান্য ছিল, (কারণ স্বরূপ শিক্ষায় পশ্চাৎপদ মুসলিমদের মধ্যে শিক্ষক হবার মত উচ্চ শিক্ষিতের হার সে সময় যথেষ্ট কম ছিল)। যাইহোক এই সভায় প্রস্তাবিত বিলটি কে 'প্রতিক্রিয়াশীল ও জাতীয়তা বিরোধী' বলে চিহ্নিত করা হয়। ন্যায্যতঃ এখানে সরকারি নিয়ন্ত্রণের প্রতিবাদ করা হলেও, কেন মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ বাংলায়, শিক্ষাক্ষেত্রে মুসলিমদের জন্য সংরক্ষণের প্রয়োজন হচ্ছে- সে সম্বন্ধে A.B.T.A. নেতারা নিশ্চুপ থাকেন। অবশ্য 'হিন্দু নেতারা' নিশ্চিত থাকলেও, প্রধান শিক্ষকদের বাদ দিয়ে বোর্ডের শিক্ষক প্রতিনিধি না থাকার ও প্রতিবাদ করে সমিতি।[২০]

আমরা জানি যে নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির শিক্ষকেরা মূলতঃ স্কুল ম্যানেজিং কমিটি গুলির স্বেচ্ছাচার ও স্বৈরতান্ত্রিক মনোভাবের বিরোধিতা করার মধ্য দিয়েই শিক্ষক সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। নতুন বিলে

বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সঙ্গে ম্যানেজিং কমিটির ক্ষমতা হ্রাস করার কথায় তাদের সমর্থন থাকাই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে সমিতি এই বিলের বিরোধিতায় তাদের শত্রুপক্ষ ম্যানেজিং কমিটিগুলির সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে আন্দোলনে নামে। একমাত্র, বাঙালি ভদ্রলোক শ্রেণীর (শিক্ষকের বেশীর ভাগই ছিলেন এই শ্রেণীভুক্ত) মনের গভীরে লুকিয়ে থাকা সাম্প্রদায়িক মনোভাবের প্রকাশ ছাড়া তৎকালে শিক্ষকবৃন্দের এই কার্যকলাপের আর কোন কারন নির্দেশ করা যায় না-এই (অপ) চেতনা এতটাই গভীর ছিল যে, প্রতিনিয়ত বেতন সংক্রান্ত ও চাকরির শর্তাবলী সম্পৃক্ত প্রশ্নের মুখে দাঁড়িয়েও তারা তাদের স্বশ্রেণীভুক্ত বর্ণ হিন্দু ভদ্রলোক ম্যানেজিং কমিটির সদস্যদের পাশে দাঁড়াতে দ্বিধাবোধ করেনি।[২১]

আলোচ্য বছরে ১৮ আগস্ট কলিকাতা জেলা স্কুল সমিতির বার্ষিক সম্মেলনে শ্যামাপ্রসাদ হিন্দুদের জন্য পৃথক মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড গঠনের প্রস্তাব দিলে, তা সাড়ম্বরে গৃহীত হবার মধ্য দিয়ে 'উগ্র হিন্দুত্বের ধ্বজাধারী প্রস্তাবকের' সঙ্গে 'প্রগতিশীল' শিক্ষকদের শ্রেণী চরিত্রের সাযুজ্যের প্রকাশ ঘটেছিল। এরপরে ২৮ শে ডিসেম্বর ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে, নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি আহ্বান এই অশুভ বিলটি প্রত্যাহার দাবি জানানো হয়। শিক্ষক নেতৃবৃন্দ মত প্রকাশ করেন এই বিলটি শিক্ষার প্রসার হ্রাস করবে ও এটা জাতীয়তা বিরোধী। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় মাথাভারী প্রশাসনের হাত থেকে আলাদা বোর্ডের হাতে মাধ্যমিক শিক্ষা দেয় ন্যস্ত হলে অবশ্য মাধ্যমিক শিক্ষার প্রসার বৃদ্ধি পাবার কথা ছিল। বর্ণ হিন্দুরা নয় -বাংলা সংখ্যাগুরু মুসলিম জনতার বৃহদংশই তখন অশিক্ষার অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল। তথাকথিত মুসলিম প্রাধান্য যুক্ত বোর্ড তাদের মধ্যে শিক্ষার প্রসারে অধিকতর আগ্রহের সঙ্গে ব্রতি হবে, এটাই স্বাভাবিক। তাই সমিতির উক্ত বক্তব্য কোনোভাবেই ধোপে টেকে না। আর জাতীয়তাবাদের নামে হিন্দু প্রভুত্ববাদ চাপিয়ে দেবার যে খেলা উগ্র হিন্দুত্ববাদী রা ও তৎকালীন কংগ্রেসের নরম হিন্দুরা খেলতেন, শিক্ষকসমাজ- তথাকথিত এগিয়ে থাকা গোষ্ঠী হলো তারই সহজ শিকার হয়ে পড়েছিলেন, এ কথা বলা যেতেই পারে।

সত্যি কারের জাতীয়তাবাদে তো সংখ্যাগুরু এবং সংখ্যালঘু উভয়েরই সমান সুযোগ পাবার কথা। দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে যতক্ষণ সমতা প্রতিষ্ঠা না হচ্ছে, ততক্ষণ সুবিধাহীন শ্রেনিটিকে বিশেষ সুবিধা দানের মাধ্যমে সুবিধাভোগী শ্রেণীর সম পর্যায়ে পৌঁছে দিতে হবে- এটাই নীতি। চিত্তরঞ্জন দাশ যখন 'বেঙ্গল প্যাকেজের' মাধ্যমে এই নীতি প্রয়োগ করে, প্রকৃত জাতীয়তাবাদ প্রয়োগ করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন, তখন ও কংগ্রেসের ভেতরের ও বাইরের হিন্দুত্ববাদীরা উপরোক্ত ধরনের জাতীয়তাবাদের ধুঁয়ো তুলেই, এর বিরোধিতা করেছিলেন - এটা আমরা দেখেছি।[২২]

যাইহোক, ইতোমধ্যে নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির নেতৃত্বে প্রায় ৪০০ মত বিশ্ববিদ্যালয় প্রস্তাবিত বিলের বিরোধিতা করে প্রস্তাব গ্রহণ করে। এই স্কুলগুলির বেশিরভাগই ছিল পূর্ববঙ্গের। বাংলার এই পূর্বভাগে জনতার বৃহদংশ মুসলিম জনগোষ্ঠীভুক্ত। প্রস্তাবিত মাধ্যমিক বোর্ডের সংরক্ষণের মাধ্যমে অধিকতর মুসলিম সদস্য নির্বাচিত হলে, এ অঞ্চলের শিক্ষকদের অর্থনৈতিক ও অন্যান্য ক্ষেত্রে তো সুবিধা হওয়ারই কথা। কেননা মুসলিম সংখ্যাধিক্য মানেই বোর্ডের পূর্ববঙ্গের প্রতিনিধির সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া-এর একমাত্র ফল পূর্ববঙ্গের গ্রামীণ জোতদারও 'অনুপস্থিত জমিদারবৃন্দের' প্রতিনিধি সংকুল স্কুল ম্যানেজিং কমিটি প্রভাব হ্রাস ছাড়া কিছুই নয়। এর ফলে উপকৃত হত ধর্ম নির্বিশেষে শিক্ষকরাই। আসলে ধার্মিকতা তখনই সাম্প্রদায়িকতায় পরিণত হয়, যখন কোন একটি নির্দিষ্ট ধর্মের সব মানুষ শ্রেণী নির্বিশেষে স্বধর্মের সব মানুষের আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্বার্থের তত্ত্বে বিশ্বাসী হয়ে ওঠেন।[২৩] তৎকালীন শিক্ষকবৃন্দ তাঁদের সংগঠন A.B.T.A. নেতৃত্ববৃন্দ সেই একই ভুলের শিকার হয়েছিলেন, এটা বলা যেতেই পারে। আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্যায়ের ১৯৩৭ এর খুলনায় অনুষ্ঠিত A.B.T.A. এর প্রাদেশিক সম্মেলনে প্রস্তাব নেয়া হয়েছিল, 'ইহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে শিক্ষার মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিষ প্রবেশ করিলে, শিক্ষার উন্নতির পথ একেবারে রুদ্ধ হইয়া যাইবে। আমরা শিক্ষক আমাদের নিকট হিন্দু মুসলমান সব ছাত্র সমান...। শিক্ষা সম্পর্কে

আমরা জাতি-ধর্মের গণ্ডির বাহিরে। সুতরাং শিক্ষাব্যবস্থায় যাহাতে সাম্প্রদায়িক বিষ প্রবেশ না করে তার জন্য, আমাদিগকে অবহিত হইতে হইবে'। প্রসঙ্গত এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেছিলেন গোড়া হিন্দুত্ববাদী ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার। ১৯৩৮ এবং ৪০ এর প্রাদেশিক সম্মেলনে ও সমিতি একই দাবির পক্ষে সোচ্চার হয়েছিল।

যেখানে প্রস্তাবিত বোর্ডের শিক্ষক ও শিক্ষা ব্যবস্থার পরিপূর্ণ বিকাশের স্বার্থে শিক্ষক প্রতিনিধিত্ব রাখবার দাবি গুরুত্ব পাওয়া উচিত ছিল, সেখানে উক্ত প্রস্তাবের মধ্য দিয়ে মিঠে মিঠে কথার অন্তরালে কায়েমী বর্ণহিন্দু গরিষ্ঠ ম্যানেজিং কমিটি গুলির পৃষ্ঠ কন্ডুয়ন সেদিন শিক্ষক নেতৃবৃন্দ করেছিলেন-এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। এদিকে ১৯৪০ এর ৬ আগস্ট অ্যালবার্ট হলে ডাক্তার হরেন্দ্র কুমার মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের শিক্ষকেরা পুনরায় 'বিল'-এর বিরুদ্ধে মিলিত হন। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে অবধি শিক্ষকদের প্রতিবাদ চলতেই থাকে।[২৫]

সবচেয়ে আশ্চর্য লাগে যখন সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণাণ, যদুনাথ সরকার, রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় এর পাশাপাশি সর্বতোভাবে অসাম্প্রদায়িক আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়, বিলটির গঠনগত দিক বা শিক্ষক প্রতিনিধিত্ব না থাকার বিষয়ে সমালোচনার পরিবর্তে, প্রস্তাবিত বোর্ডের সমালোচনা করতে গিয়ে বলেন, '...বর্তমান সরকার যত অপকর্ম ও অপচেষ্টা করেছে তার মধ্যে মাধ্যমিক শিক্ষা বিল হচ্ছে জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিতে সবচাইতে ক্ষতিকর'। দুর্ভাগ্যজনকভাবে এরপরে জাতীয়তাবাদের ক্ষতি বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি মন্তব্য করেছিলেন, 'সরকারি স্কুল আর দেড়শোর কিছু কম খ্রিস্টান মিশনারি স্কুল বাদে এই প্রদেশে মাধ্যমিক শিক্ষা যেসব বিদ্যালয় আছে তা হিন্দুর তৈরি আর হিন্দুরা চালায়। ...তাদের সংস্কৃতির মূলে আঘাত হানে সে ব্যবস্থা হিন্দুরা মানতে রাজি নয়'।[২৬] না - প্রফুল্ল চন্দ্র কে সাম্প্রদায়িক বলার সাহস বর্তমান প্রবন্ধ লেখক নেই।তবু বলতেই হয়, এখানেও যেন বিলটি 'শিক্ষা বিরোধী' বলে নয় -কায়েমী বর্ণ হিন্দু সম্প্রদায়ের পক্ষে ক্ষতিকারক বলেই সমালোচিত হয়েছে।

আসলে পুরোপুরি অসাম্প্রদায়িক মানুষ তৎকালীন বাংলার প্রধানমন্ত্রী ফজলুল হক বাংলার সাধারণ মানুষ হিসেবে বিশেষ করে তাদের বৃহদংশ পশ্চাৎপদ মুসলিম জনতার স্বার্থ রক্ষা করা ও শিক্ষা ক্ষেত্রে তাদের ন্যায্য প্রতিনিধিত্ব সংরক্ষণ করার জন্যই মাধ্যমিক শিক্ষা সংক্রান্ত এই বিল এনেছিলেন। মন্ত্রিসভার অন্য শরিক মুসলিম লীগের অভিজাত নেতৃত্ব এক্ষেত্রে তাদের স্বার্থ অনুযায়ী সাম্প্রদায়িকতা-মৌলবাদ এর তাস খেলে, ঘোলা জলে মাছ ধরতে চাইলেও, ফজলুল হকের কাজের মধ্যে এই চিন্তার কোনো ছাপ ছিল না, আমরা কি করে ভুলে যাই যে আজীবন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির প্রতীক হক সাহেব, ১৯৩৭ এর নির্বাচনের পর কংগ্রেসের সঙ্গে জোট করেই তার কৃষক প্রজা পার্টির নেতৃত্বাধীন সরকার গঠন করতে চেয়েছিলেন। কংগ্রেস নেতৃত্বের অপরিনামদর্শীর তার ফলে বাধ্য হয়ে তাকে মুসলিম লীগের হাতে হয়েছিল।[২৭] মনে রাখতে হবে ভূমি সংস্কারের লক্ষ্যে 'ফ্লাউড কমিশন' গঠন এবং সেই সূত্রে বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব সংশোধনী আইন, বঙ্গীয় প্রাদেশিক প্রাথমিক শিক্ষা আইন প্রভৃতির মাধ্যমে তিনি পূর্বেই কায়েমী উচ্চবর্ণ হিন্দু জমিদারদের স্বার্থে আঘাত এনেছিলেন, (সঙ্গে অবশ্যই অভিজাত বংশজাত মুসলিম জমিদারদের স্বার্থে আঘাত পড়েছিল) প্রস্তাবিত মাধ্যমিক শিক্ষা বিল এই পথে 'হাজার বছরের চলমানশব', সেই বর্ণহিন্দুদের শিক্ষা ক্ষেত্রে মৌরসী পাট্টা অবসান ঘটাতে চেয়েছিল- এই সংক্রান্ত ক্রোধের প্রতিফলন ঘটেছিল বর্ণ হিন্দুদের আচরণে-আর শ্রেণীগত বিরোধের থেকেও বর্ণগত একতা রুদ্ধ করে দিয়েছিল-অন্ততঃ সাময়িক ভাবেশিক্ষকদের স্বচ্ছ দৃষ্টি।

যাই হোক কিছুদিনের মধ্যেই মুসলিম লীগের সঙ্গে মূলগত বিরোধের ফলে লীগ হক মন্ত্রিসভার পতন ঘটলে, আপাতত মাধ্যমিক শিক্ষা বিল বাস্তবায়িত করা সম্ভব হলো না। তাছাড়া তখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের দামামা বেজে গিয়েছে- শুরু হয়েছে পঞ্চাশের মন্বন্তর। সবারই দৃষ্টি আরও বৃহত্তর ক্ষেত্রে সরে গিয়েছিল। শিক্ষক নেতৃবৃন্দও সাম্প্রদায়িকতার পক্ষে সহমত পোষণকারী, স্কুলসমূহের জমিদার-মালিকদের ও ম্যানেজিং কমিটি গুলির সঙ্গে তাদের পুরনো শত্রুতার দিনে ফিরে গিয়েছিল। 'অন্ন চিন্তা চমৎকারা'র আহবানে শিক্ষক সমিতি আবার লড়াই শুরু

করেছিল স্কুল কর্তৃপক্ষ সমূহের বিরুদ্ধে। মাধ্যমিক শিক্ষা বিল নিয়ে A.B.T.A.এর আন্দোলন তার জন্মাবধি প্রতিবাদী ভূমিকায় চন্দ্রকলঙ্কের মত ইতিহাসের পাতায় মুখ লুকিয়ে ছিল।

সূত্র নির্দেশ:

১. পর্ষদ বার্তা - সত্যপ্রিয় রায় জন্মশতবর্ষ স্মরণ সংখ্যা -সং পার্থ রায়, পৃষ্ঠা ২০ থেকে ২১
২. সুবর্ণ জয়ন্তী স্মরণিকা - নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি - সং অনিলাদেবী, পৃষ্ঠা -০১
৩. তদেব পৃষ্ঠা -১
৪. শিক্ষায় শীর্ষ স্থপতি স্যার আশুতোষ- শ্যামল চক্রবর্তী- পৃষ্ঠা- ৯৩
৫. প্রসঙ্গঃ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়- ডঃ দীনেশচন্দ্র সিংহ- পৃষ্ঠা- ৪৫৬
৬. প্রসঙ্গঃ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়- তদেব- পৃষ্ঠা- ৪৫৯ থেকে ৬১
৭. ভারতে শিক্ষা ইতিহাস- ডঃ হরিসাধন গোস্বামী, পৃষ্ঠা- ২৫৩ থেকে ৫৪
৮. বাঙালি বুদ্ধিজীবী ও বিচ্ছিন্নতাবাদ- অমলেন্দু দে- পৃষ্ঠা- ২৪০
৯. ফজলুল হক জীবন ও রাজনীতি- সচ্চিদানন্দ ব্যানার্জি, পৃষ্ঠা- ৩৩
১০. ফজলুল হক ...তদেব- পৃষ্ঠা- ৩৩ থেকে ৩৪
১১. আকাদেমি ভাষণ সংকলন (সং) সনৎ কুমার চট্টোপাধ্যায়-পৃষ্ঠা- ২৯৬
১২. প্রসঙ্গ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়- প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ৪৬৯
১৩. আকাদেমি ভাষণ সংকলন (সং) সনৎ কুমার চট্টোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা- ৩০৩
১৪. The origin and development of WBBSE – DR. Mrinal Kanti Dutta, পৃষ্ঠা- ১৩
১৫. Bengal Muslims in search of social identity – Dhurjati Prasad De, উদ্ধৃত প্রসঙ্গ কলকাতা পৃষ্ঠা - ৪৭০
১৬. Struggle and Strife in urban Bengal – Dr. Pranab Kr. Chattopadhya পৃষ্ঠা - ৪৭১
১৭. প্রসঙ্গ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়- প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ৪৭১
১৮. তদেব- পৃষ্ঠা- ৪৬৯
১৯. আকাদেমি ভাষণ সংকলন- প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা- ২১৯
২০. শিক্ষা ও সাহিত্য প্লাটিনাম জুবিলি সংখ্যা (সং) - অজিত বাগ, পৃষ্ঠা- ৪৬৫
২১. চুয়ান্নর স্মরণীয় বারোদিন- শচীন্দ্র কুমার মজুমদার, পৃষ্ঠা- ৫ থেকে ৬
২২. চিত্তরঞ্জন দাশ ও বাংলা রাজনীতি- প্রবাল সেনগুপ্ত, পৃষ্ঠা- ১১৫
২৩. আধুনিক ভারত ও সাম্প্রদায়িকতাবাদ-বিপান চন্দ্র, পৃষ্ঠা- ১ থেকে ২
২৪. A.B.T.A. প্লাটিনাম জুবিলী সংখ্যা- প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ৪৬৫ থেকে ৬৬
২৫. চুয়ান্নর স্মরণীয় বারোদিন- শচীন্দ্র কুমার মজুমদার, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ৭
২৬. আকাদেমি ভাষণ সংকলন - প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা -৩১৩
২৭. পুরশ্রী - ফজলুল হক সংখ্যা- পৃষ্ঠা -২২